শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর

কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত

ছায়াছবি

সম্পাদনা

বাঁধন সেনগুপ্ত

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

ডাক্তার	❑	৩৫
নন্দিনী	❑	১০৩
বন্দী	❑	১২৯
শহর থেকে দূরে	❑	১৯৭
মানে না মানা	❑	২৬৭
খেলার পুতুল	❑	৩৬৩
আমি বড়ো হব	❑	৩৪৭

ডাক্তার

এক

জমিদার শিবনাথ চৌধুরী বলেন, চিকিৎসা ব্যবসাটা বৈদ্যদের একচেটে—এই তো শুনি চিরকাল, কিন্তু আমাদের বংশটা বামুন হয়েও কেন যে বদ্যি হল জানি না।

শ্রোতার দল হাঁ করে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

শিবনাথ বলেন, আমার ঠাকুরদাদার এ-সব বালাই ছিল না। তিনি শুধু প্রাণপণে খেটেছেন, টাকা খাটিয়েছেন, আর জমিদারি করে গেছেন; কিন্তু আমার বাবা ছিলেন মস্ত বড়ো কোবরেজ। শেষ বয়সে অবশ্য কোবরেজি তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কেন ছেড়ে দিয়েছিলেন সে-কথা সবাই জানে। কারণ এই একই গল্প তাঁর কাছ থেকে তারা বহুবার শুনেছে। তবু জমিদার মানুষ, কথাটা আর একবার বলে যদি তিনি আনন্দ পান, তো আর একবার শুনতেই বা দোষ কী!

শ্রোতাদের মুখের পানে তাকিয়ে কথাটা তিনি এই বলে শেষ করলেন যে, তাঁর এক পিসিমার একবার গলায় হয়েছিল ক্যানসার, ভেবেছিলেন কবিরাজি ঔষধেই রোগটা তিনি সারিয়ে দেবেন, কিন্তু সারাতে কিছুতেই যখন পারলেন না, তখন কবিরাজি চিকিৎসা তিনি পরিত্যাগ করলেন।

শিবনাথবাবু বললেন, পিসিমার মৃত্যুর দিনে বাবা ঠিক ছেলেমানুষের মতোই কেঁদেছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বলেছিলেন—যে-দেশের মাটিতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেই দেশের মাটিতে ভগবান যেমন তার ক্ষুধার অন্ন ঠিক করে রাখেন, তেমনি তার সব রকমের সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধিও সেই মাটিতেই থাকে। আমরা জানি না, জানতে চাই না, তাই আমরা বিদেশি ডাক্তার আর ওষুধের মুখ তাকিয়ে বসে থাকি।

এমনি ছিল তাঁর মনোভাব।

অবশ্য কবিরাজি ছেড়ে দিয়ে চুপ করে তিনি বসে ছিলেন না। শেষ বয়সে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অনেকগুলো ভালো ভালো সব বই তিনি কিনেছিলেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমি তাই এই বিদ্যেটা আমার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি!—এই বলে শিবনাথবাবু তাঁর হোমিওপ্যাথি ঔষধের কাঠের বাক্সটা হাতের কাছে টেনে এনে সমবেত রোগীদের রোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ প্রকাণ্ড একটা খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন।

নিতান্ত মারাত্মক ব্যাধি না হলে ঔষধ অবশ্য প্রথম দিনে পাওয়া যায় না। দুদিন সময় লাগে তাঁর ঔষধ নির্বাচন করতে। বলেন, বিদেশি হলেও মহাপুরুষ যারা তাঁদের কীর্তি আমাদের স্বীকার করতে হবে। এই হোমিওপ্যাথি জিনিসটি হ্যানিম্যান-সাহেবের অনেক দিনের সাধনার ফল। এ একেবারে অদ্ভুত—অব্যর্থ। না কি বল হে জনার্দন?

সূর্য হয়তো কোনো দিন ঠিক সময়ে না দেখা দিতেও পারেন, কিন্তু জমিদার শিবনাথবাবুর বৈঠকখানায় প্রত্যহ ঠিক নিয়মিতভাবে এই জনার্দনের আবির্ভাব যে হবেই, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। জনার্দনের একটি অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র একদিন এক নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে প্রচণ্ড গুরু-ভোজনের পর একটি টাকা বাজি রেখে আড়াই দিস্তা লুচির সঙ্গে সেরদেড়েক রসগোল্লা প্রাণপণে আহার করে ফেলে, এবং তার ফলে কঠিন আমাশয় রোগে ছেলেটি হয় মরণাপন্ন। পরে একদিন শিবনাথবাবুর মাত্র একটি ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ঔষধে সে উঠে বসে।

সেই থেকে এই বুড়ো জনার্দন হয়েছে তাঁর এবং হোমিওপ্যাথির একজন গোঁড়া ভক্ত।

শিবনাথবাবুর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য দয়াল কিন্তু অন্য কথা বলে।

বলে, ভক্ত না ঘোড়ার ডিম! সকাল বেলা খরচ হবে বলে বুড়ো নিজের বাড়িতে চা না খেয়ে এইখানে চা খেতে আসে। চা খায় আর ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানে। বাবু তো আমাদের শিবতুল্য। জনার্দনের তিন বছরের খাজনা বাকি ছিল, বাবু সেদিন তাও দিলেন মকুব করে। এমন হলে বাবা, ভক্ত সবাই হয়।

কথাটা অন্য লোকেও বলে বটে!

বলে, জমিদারবাবুর ও একটা রোগ! তাঁর হোমিওপ্যাথি ওষুধে রোগী যদি না সারে, তবু বলতে হবে সেরেছে। সারেনি বললেই রেগে কাঁই! বলেন, তাহলে কি বলতে চাও, ওষুধ আমি ঠিক নির্বাচন করতে পারিনি? অসম্ভব। আমরা হলাম গিয়ে চিকিৎসকের বংশ। আমাদের আর যেখানেই ভুল হোক, রোগীতে ওষুধে ভুল কখনও হবে না।

এর উপরে একটি কথা বলেছ কি — বাস্! তার আর রক্ষা নেই।

এই নিয়ে গ্রামে একটা বিশ্রী রকমের কেলেঙ্কারিও ঘটে গেছে।

সুরেন চাটুজ্যে নামে এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসর আগে তার একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর হুগলি জেলার কোন্ এক গ্রাম থেকে এই গ্রামে এসে বসবাস করেন। হুগলি থেকে আসবার সময় ম্যালেরিয়ার বীজ বোধ করি তিনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন। ভদ্রলোক প্রায় জ্বরে ভোগেন, মেয়েটির বয়স বেশি নয়, একা বাড়িতে রোগী নিয়ে বেচারা বড়োই বিব্রত হয়ে পড়ে। শিবনাথবাবু খবর পেয়ে একদিন তাকে দেখতে গেলেন। বললেন, এ কিছু না, আমি তোমাকে ভালো করে দেব। সেই দিন থেকে শিবনাথবাবুর হোমিওপ্যাথি ওষুধ চলতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ওষুধের পর ওষুধ চলতে থাকে, সুরেনের জ্বর আর সারে না!

জ্বরও ছাড়ে না, ডাক্তারও ছাড়ে না!

সুরেন যত বলে, আমি একবার শহরে গিয়ে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে আসি, শিবনাথবাবুর জেদ যেন তত বেশি চেপে বসে। রাত জেগে বই পড়ে ওষুধ দেন, আর অধীর আগ্রহে তার জ্বর ছাড়বার অপেক্ষা করেন। কেমন আছে দেখবার জন্যে দয়ালকে ঘন ঘন তার বাড়ি ছুটতে হয়। দয়াল ফিরে এসে বলে, ও হুগলির মেলোয়ারি বাবু, ওকে দখ্নে মেলোয়ারি বলে। ও দক্ষিণে না নিয়ে যায় না।

শিবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করেন, তুই কেমন করে জানলি দয়াল?

দয়াল বলে, হুগলি জেলায় আমার এক মাসির বাড়ি ছিল বাবু, আমি একবার গিয়েছিলুম।

শিবনাথবাবু তখন হোমিওপ্যাথি মেটিরিয়া মেডিকা পড়ছিলেন। বললেন, তারপর? গিয়ে কী দেখলি?

দয়াল বললে, দেখলুম গাঁকে-গাঁ জ্বরে ভুগছে। এমনি সময় জঙ্গল থেকে একদিন একটা বাঘ বেরুল। ঘরে ঘরে রুগি, বাঘ তাড়াবে কে? বাঘটা একজনের ঘরে ঢুকে একটা মেলোয়ারি

রুগিকে খেয়ে ফেললে। দিনকতক পরে দেখা গেল, গাঁয়ের ধারে একটা বাবলা গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে বাঘটা কাঁপছে। দলে দলে সব বাঘটাকে দেখতে গেল। সবাই বললে, ব্যাটাকে মেলোয়ারিতে ধরেছে। জব্দ হয়ে গেছে। ব্যাটা মরবে। বাস্, উপোস দিয়ে কুঁহরকুঁহর করে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাটা সেই বাবলাতলাতেই মরে গেল।— এই সেই বেঘো-মেলোয়ারি বাবু। ওষুধে ওর কিছু হবে না।

বেঘো-মেলোয়ারির গল্পটা শুনে শিবনাথবাবু হেসে উঠলেন।

হেসে উঠলেন বটে, কিন্তু মনে মনে তখন হোমিওপ্যাথির উপর না হোক অন্তত নিজের উপর কেমন যেন একটুখানি অবিশ্বাস হয়েছে।

তাঁর একমাত্র পুত্র অমরনাথ তখন আই-এস-সি পাস করে বাড়িতে বসে আছে। তার পরের দিনই কাউকে কিছু না জানিয়ে অমরনাথকে নিজে তিনি সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় গেলেন। গিয়ে অনেক টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে অ্যালোপ্যাথি একটা মেডিক্যাল ইশকুলে তাকে ভর্তি করে দিয়ে বললেন, যেমন করেই হোক এখান থেকে তোমাকে পাস করতে হবে অমরনাথ! আমাদের বংশে মস্ত বড়ো একজন ডাক্তার হোক এই আমি চাই।

অমরনাথ কলকাতায় রইল। শিবনাথবাবু গ্রামে ফিরে এলেন।

ফিরে এসেই একদিন কী একটা কাজের জন্য গ্রামের বারোয়ারি তলায় তিনি বেড়াতে গেছেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল — অনেকগুলো লোকের মাঝখানে সুরেন চাটুজ্যে রয়েছে বসে; জ্বর তার সেরে গেছে দেখে মনে-মনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সেরে গেছ সুরেন? আমি তখন বললাম আমার ওষুধ —

কথাটা তাঁকে শেষ করতে দিলে না। কেমন যেন বিরক্ত ভাবে সুরেন জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সেরেছি। কিন্তু আপনার ওষুধে নয়।

শিবনাথবাবুর মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। তবু তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কার ওষুধ খেয়েছ?

সুরেন বললে ঃ সে সব আপনার শুনে কী হবে? আপনি শুধু জেনে রাখুন — ডাক্তারি আপনি জানেন না।

এতগুলো লোকের সুমুখে তাঁরই জমিদারিতে বাস করে তাঁর উপর এই জবাব! শিবনাথবাবুর মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। ইচ্ছে করলে তিনি তাকে অপমান করতে পারতেন, কিন্তু মনের রাগ মনেই চেপে তিনি গুম হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেলেন, কে যেন সুরেনকে বলছে, ছিঃ ছিঃ, এমনি করে ওঁকে বলে!

সুরেন জবাব দিলে ঃ না, বলবে না! মিছেমিছি আমাকে জল খাইয়ে তিন মাস শুইয়ে রেখে — এখন বলে কিনা, আমার ওষুধে —

আর কিছু শোনবার জন্যে তিনি অপেক্ষা করলেন না। জনার্দন সঙ্গে ছিল। বললেন, এসো জনার্দন!

এই বলে জনার্দনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

এই অপমান শিবনাথবাবু মনের মধ্যে চেপে রাখলেন। বাড়িতে এসে তাঁর অবস্থা হল আরও খারাপ। রাজবাড়ির মতো প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়িতে এমন একটি মানুষ নেই যার কাছে দু-দণ্ড বসে, অন্তত মনের কথা বলতে পারেন। স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন। একটি মাত্র ছেলে অমরনাথ, তাকেও তো কলকাতায় রেখে এলেন ডাক্তারি পড়বার জন্যে। এত বড়ো বাড়িতে মাত্র তাঁর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য দয়াল। নীচে কাছারি-বাড়িতে আমলা গোমস্তা

দাসদাসী পাইক পেয়াদার অভাব নেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে জমিদার শিবনাথ চৌধুরীর কীসের সম্বন্ধ? আজ এতদিন পরে তাঁর মনে হল— বাড়িটা একেবারে ফাঁকা।

প্রতিদিন সকালে রোগীরা যেমন ওষুধ নিতে আসে, তার পরের দিনও তেমনি এল। পূজা-আহ্নিক শেষ করে, শিবনাথবাবুও গম্ভীর মুখে নীচে নেমে এলেন খড়ম পায়ে দিয়ে। প্রত্যহ যেখানে বসেন, সেদিনও সেইখানেই বসলেন, দয়াল গড়গড়ায় তামাক দিয়ে গেল, শিবনাথবাবু নলটা মুখে নিয়ে বললেন ঃ ওষুধ আজ আর দেব না।

জনার্দন বলে উঠল ঃ কেন?

শিবনাথ বললেন ঃ নাঃ, তোমরা অন্য ডাক্তার দেখাও গে।

মাত্র জনার্দন বুঝতে পারলে— কেন তিনি এ-কথা বলছেন। তৎক্ষণাৎ সে উঠে গিয়ে নিজেই ওষুধের বাক্সটা তুলে এনে তাঁর হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে ঃ ওসব চলবে না। ওষুধ আপনাকে দিতে হবে। কোথাকার কে এক হারামজাদা—

এতগুলো লোকের সামনে সুরেনের নামটা পাছে সে বলে বসে, শিবনাথবাবু তাই কৌশলে তাকে চোখ টিপে নিষেধ করলেন। তারপর গড়গড়াটা পরিয়ে দিয়ে ঈষৎ হেসে বললেনঃ কিছুতেই ছাড়বে না তাহলে? আচ্ছা বল!

বলে রোগীদের খাতাটা টেনে নিয়ে তিনি রোগীর নাম ও রোগের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করলেন।

এমনি করে দু-একদিনের ভেতরেই হয়তো সুরেনের কথাটা তিনি ভুলে যেতে পারতেন, কিন্তু গ্রামের লোক বোধকরি ভুলতে তাঁকে দিলে না। প্রায় প্রত্যহই কেউ না কেউ এসে বলতে লাগল ঃ সুরেন কী বলে জানেন? বলে হোমিওপ্যাথি আবার ওষুধ!

হোমিওপ্যাথির নামে কলঙ্ক শিবনাথবাবু সহ্য করবেন না! রেগেই জিজ্ঞাসা করেন ঃ কী বলে?

লোকটা হয়তো তাঁকে আরও বেশি করে রাগাবার জন্যে বলে ঃ সুরেন বলতে আরম্ভ করেছে — শিবনাথবাবু একটি বদ্ধ পাগল!

ফল হল উলটো। শিবনাথবাবু একটু হেসে বলেন ঃ — তা বলুক। আমাকে যা খুশি তাই বলুক ক্ষতি নেই, কিন্তু হোমিওপ্যাথির অপমান আমি সহ্য করব না।

এর একটা যা হোক কিছু প্রতিবিধান করবার উদ্দেশ্য বোধকরি ছিল জনার্দনের। সে ঠিক এক মাসের মধ্যে অনুসন্ধানের পর সুরেন সম্বন্ধে এমন একটা সংবাদ শিবনাথবাবুর কাছে বহন করে নিয়ে এল — যা শুনে তিনি একটুখানি অবাক হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সত্যি বলছ তো জনার্দন?

জনার্দন বললে ঃ প্রমাণ চাই?

শিবনাথ বললেন ঃ হ্যাঁ, চাই।

একজন বিশ্বাসী লোক দিন আমার সঙ্গে। হুগলি জেলায় চলুক সেই পাঁচথুপি গ্রামে — সুরেন সেখান থেকে এসেছে, আমি, প্রমাণ করে দিচ্ছি।

শিবনাথবাবু একবার চোখ বুজে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন ঃ মরুকগে, ওসব ছেড়ে দাও জনার্দন। সুরেনের ভগ্নী গৃহত্যাগই করুক আর কুলত্যাগই করুক, তার জন্যে সুরেনের শাস্তি হওয়া বোধ হয় উচিত নয়।

জনার্দন সেকেলে মানুষ। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শিবনাথ চৌধুরীর মুখে এ কথা শুনবে আশা করে নি। তার উপর লোকটাকে জব্দ করবার এত বড়ো একটা সুযোগ হাতে পেয়েও তিনি যদি চুপ করে থাকেন তা হলে তাঁর অপমানের প্রতিশোধই বা নেওয়া হল কোথায়?

জনার্দন কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, আপনার অপমান আপনি নিজে হয়তো ভুলে যেতে পারেন, আমি কিন্তু ভুলব না। আপনাকে নিজে যেতে হবে।

কোথায়?

আমার সঙ্গে — সেই পাঁচথুপি গ্রামে।

কেন?

ঘটনাটা সত্যি কিনা বেশ ভালো করে জেনে আসি চলুন।

শিবনাথবাবুর এতটা করবার ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না। কিন্তু ভক্তের অসাধ্য কিছু নেই। ভগবানকে নরকে টেনে নিয়ে যেতেও সে পারে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই তাঁরা দুজনে একদিন গোপনে পাঁচথুপি রওনা হয়ে গেছেন।

যেমন গোপনে রওনা হলেন, আবার তেমনি গোপনেই ফিরে এলেন। শিবনাথবাবু নিজে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু জনার্দনের মুখে শোনা গেল ঘটনাটা সত্যি।

জনার্দনের ইচ্ছা ছিল — এই নিয়ে গ্রামের মধ্যে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, কিন্তু যার জন্যে এত কাণ্ড, সেই শিবনাথবাবুই বাদ সাধলেন। বললেন, ছিঃ জনার্দন, তুমি চুপ করে থাকো। এ রকম করলে আমারই দুর্নাম হবে।

কাজেই প্রায় বছর-খানেক ধরে গ্রামের মধ্যে কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে মুখরোচক এই মজার সংবাদটা লোকের মুখে মুখে ধোঁয়াতে লাগল, দপ করে জ্বলে উঠবার অবসর পেলে না।

একবছর পরে, সেবছর ফাল্গুন মাসে হঠাৎ শোনা গেল, সুরেনের একমাত্র কন্যা মায়ার বিবাহ। মেয়েটি দেখতে পরমা সুন্দরী, অনেক কষ্টে সুরেন একটি পাত্র জোগাড় করছে। পাত্রটি দেখতে শুনতে তেমন ভালো না হলেও শোনা গেল, সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের সন্তান, মেয়েটির মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কোনোদিন হবে না।

জনার্দন শুনলে। শুনে একটুখানি হাসলে মাত্র।

বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। সুরেন আয়োজন মন্দ করলে না। বিয়ের রাত্রে বরযাত্রীদের সঙ্গে, সুরেন ঠিক করলে, গ্রামের ষোলোআনা ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দেবে।

সন্ধ্যায় বর এল পালকি চড়ে, বরযাত্রী এল। বিবাহ-মণ্ডপে বর গিয়ে বসবে, ওদিকে ঘরের ভেতরে খাবার আয়োজন চলছে এমন সময় বরযাত্রীদের মধ্যে অকস্মাৎ একটা শোরগোল শুরু হল। কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? বরযাত্রীরা এ বাড়িতে কিছুতেই খাবে না, বিয়েও-এ-বাড়িতে হতে পারে না।

সুরেন জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

একজন বৃদ্ধ বরযাত্রী বলে উঠল ঃ যে ব্যাপারটা এইমাত্র শোনা গেল, আগে তার মীমাংসা হোক!

ব্যাপারটা প্রকাশিত হল নিতান্ত নির্লজ্জভাবে। সুরেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

বরকর্তা বললেন, চুপ করে রইলেন কেন? জবাব দিন।

সুরেন প্রাণের দায়ে সত্য গোপন করে বললে, জানি না।

জানি না?... বরকর্তা গেলেন চটে। বললেন, চল এ-গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করা যাক।

কে একজন বললে, জমিদারের কাছে চল।

সেই ভালো।